Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 351 – 356
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের বাৎসরিক কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি

রঞ্জিত রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বীরপাড়া কলেজ, বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার
ইমেইল : ranjitroymn1@gmail.com

Keyword
ভান্ডানি, বিষুয়া, গছাদেওয়া, তিস্তা বুড়ি, গোচরপুনা, নয়া খই।

Abstract
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। এই কৃষিকাজ বা চাষবাসে রাজবংশী সমাজের বাড়ীর বেশিরভাগ সদস্যরাই কম বেশি যোগদান করে থাকেন। আর যাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল তারা হাজিরা লোক দিয়ে চাষবাস করান। আর এই কৃষিকাজকে ঘিরে তৈরি হয় রাজবংশীদের আশা-ভরসা-স্বপ্ন। বর্তমানে রাজবংশীরা কৃষিকাজ করে সেই ভাবে লাভের মুখ না দেখায় তারা অন্য পেশায় প্রবেশ করছে। তবে গ্রামে এমন রাজবংশী কৃষক আছে যাদের এই পেশা ছাড়া অন্য উপায় নেই। অপরদিকে ভূমিহীন রাজবংশীরা কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গে বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিকাজে বাধার সৃষ্টি করে। এসব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বৈশাখ মাস থেকে শুরু করে বছরের শেষ চৈত্র মাস পর্যন্ত নানা ধরনের চাষবাস করে থাকে রাজবংশীরা। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে কৃষিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের পূজা-পার্বণ, উৎসব, মেলা লক্ষ্য করা যায়। এই আধুনিক যুগ তথা বিশ্বায়নের যুগেও রাজবংশীরা তাদের কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। সুখ দুঃখের মাঝেও রাজবংশীরা গান, অভিনয় ইত্যাদি চর্চা করে। রাজবংশীরা কৃষির উন্নতির জন্য নানা ধরনের কৃষিকেন্দ্রিক পূজা-পার্বণ করেন।। রাজবংশীদের কৃষিকেন্দ্রিক পূজা গুলো উত্তরবঙ্গের আট জেলা (কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর) ছাড়াও আসাম, নেপাল, মেঘালয়, বাংলাদেশে দেখা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গের কৃষিকেন্দ্রিক পুজা পার্বণ তথা রাজবংশীদের কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব।

Discussion
ভূমিকা : প্রবাদে বলে 'বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ।' উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মধ্যে পূজা-উৎসবাদি কম নয়। এর আড়ালে মূল দুইটি কারণ সক্রিয় বলে মনে করেন গবেষকেরা। প্রথমতঃ কৃষি কর্মের স্তরগুলিতে একটি হতে অন্যটির মধ্যেখানে সাময়িকভাবে একটি অবসর থাকে। এই অবসর সময়ে নানাবিধ দেব-দেবীর পূজা-উৎসব-সঙ্গীত-

নৃত্য ইত্যাদির কল্পনা সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কৃষিকর্মে প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা কাটাবার উদ্দেশ্যে কৃষকদের অসহায় আদিম মানসিকতা স্বাভাবিকভাবে যাদু নিয়ন্ত্রিত কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের কৃষিকেন্দ্রিক অধিকাংশ পূজা-উৎসব গুলিতে যাদুবিশ্বাসের তীব্রতা লক্ষ্য করতে পারা যায়। অংশগ্রহনের দিক থেকে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত পূজা-উৎসব সমূহকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – ১. বালকদের দ্বারা পালিত পূজা উৎসব। যেমন- পাগলাপীর, চোরখেলা, ভ্যাড়ার ঘরছুবা, বুড়া-বুড়ি, হুকাহুকি এবং আমাতির শেষ পর্যায়টি একান্তভাবে বালকদের মধ্যে সীমিত। ২. নারীদের দ্বারা পালিত পূজা উৎসব। যেমন- ধানের ফুল আনা, মেচেনী খেলা, হুদুমা খেলা, ভ্যাড়া ভাসান প্রভৃতি অনুষ্ঠান কেবলমাত্র নারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (৩) পুরুষদের দ্বারা পালিত পূজা-উৎসব। অন্যান্য প্রায় সব পূজা গুলি বয়স্ক পুরুষ দ্বারা পরিচালিত হয়। এবার রাজবংশীদের কৃষিকেন্দ্রিক পূজা পার্বণ তথা সংস্কৃতির আলোচনায় আসা যাক।

১. ভান্ডানি :

"দেবী দুর্গার লৌকিক দেবী রূপে রূপান্তরিত রূপ হল দেবী ভান্ডানি বা ভান্ডারনি। গবেষক অশোক মিত্র ভান্ডানি ও দুর্গার অভিন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন। বিজয়া দশমীর পর দেবী দুর্গা কৈলাশে গমন করছিলেন। পথে তাঁর মালপত্রের তত্ত্বাবধানকারিণী ডাক্তারনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এ জন্যে দেবীকে আরও তিনদিন মর্তে থাকতে হয়েছিল। তরাই-ডুয়ার্সে একাদশী তিথিতে ঐ দেবী আরাধনা ভান্ডানি বা ভাণ্ডারনি পুজো বলে খ্যাত।"[১] দেবী ভান্ডানি প্রথমে ছিলেন দ্বিভূজা, পরে চতুর্ভুজা এবং বর্তমানে কিছু কিছু স্থানে দশভুজা। ব্যাঘ্রবাহনা ব্যাঘ্রভীতি থেকেই এ ধারণার উৎপত্তি বলে মত প্রকাশ করেছেন ড. গিরিজাশংকর রায়। গ্রামের কৃষিজীবী রাজবংশীরা এই ভান্ডানি পূজার দিনে মানত হিসাবে পাঁঠা, পায়রা, কলা, বাতাসা, সোনা, রূপা, ধূপ ইত্যাদি দিয়ে থাকে। ময়নাগুড়ির বার্ণিশ, বালাপাড়া ও মরিচবাড়িতে ভান্ডানি পূজা হয়।

২. আমাতি :

আমাতি মূলত কামাখ্যা দেবীর ঋতুবতী হওয়ার কাল অর্থাৎ অম্বুবাচীর সঙ্গে যুক্ত। রাজবংশী সমাজে আমাতির দিন হলকর্ষণ বন্ধ রাখা হয় এবং হরিমন্দিরে, কালীমন্দিরে, তুলসীতলায় পুজা দেওয়া হয় না। শিশুরা আমাতির সময় আমাতি ধরে পথযাত্রীদের আটকায়। তখন পথযাত্রীরা লটকা, খেজুর ইত্যাদি শিশুদের দেয়। এই আমাতি পূজায় হিন্দু ও মুসলমানদের একাংশকে সামিল হতে দেখেছেন ড: গিরিজাশংকর রায়। বর্তমানে আমাতি ধরতে বাচ্চারাদের খুব কম দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে বাচ্চারা এখন পড়াশোনা, টিভি, মোবাইলে এতো সময় দেয় যে- এই সমস্ত আমাতি ধরার সময় তাদের কাছে নেই। তাছাড়া অভিভাবকরাও চান না তাদের বাচ্চারা আমাতি ধরুক। তবে বর্তমানেও এই আমাতি ধরা বিলুপ্ত হয়নি। আজও গ্রাম-গঞ্জে বাচ্চারা আমাতি ধরে থাকে।

৩. শিয়াল ঠাকুর :

গ্রাম গঞ্জের মানুষ অনেকটা স্বনির্ভর। তাই গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি,পায়রা ইত্যাদি বাড়িতে পোষে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনার জন্য। রাজবংশী গৃহস্থবাড়ির হাঁস-মুরগির ছানা, কুকুর ছানা, ছাগল ছানা শেয়াল চুরি করে নিয়ে যায়। এই ধারণা থেকে হয়তো রাজবংশী সমাজে শিয়াল ঠাকুরের জন্ম। তাছাড়া কালীর থানে ডাকিনী-যোগিনীর সঙ্গে শেয়ালকেও রক্ত পান করতে দেখা যায়। এরূপ ভয়-ভীতি ও চিন্তন থেকেই নবান্নের দিন শিয়াল ঠাকুরকে নবান্ন ভোগ প্রদান করে রাজবংশীরা। এই শিয়াল ঠাকুরের পূজা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

৪. তিস্তাবুড়ি :

"তরাই ডুয়ার্সে তিস্তা অত্যন্ত ভয়ঙ্করী নদী। রাক্ষুসী তিস্তাকে বুড়ি মা রূপে অর্থাৎ ধীর-স্থির-মনস্বিনী রূপে দেখতে চায় রাজবংশী তথা জনপদবাসী। তিস্তাকে কেন্দ্র করে বহু লোককথা, লোককাহিনি, ব্রতকথা, লোকসংগীত প্রচলিত। নদীকেন্দ্রিক জনপদে তিনি দেবীতুল্যা নারী, তাঁর রোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানাভাবে পূজা করা হয়ে থাকে।

মেচেনি খেলা, ভেদেই খেলা, তিস্তাবুড়ি পূজা, গেরা ভাসানি ইত্যাদির মাধ্যমে সন্তুষ্টি বিধান করার চেষ্টা করা হয়। তিস্তার বন্যা যাতে কৃষিজ ফসল নষ্ট না করে তার কামনা করা হয়।"[২]

মেছনি ব্রতে আলপনার ব্যবহার না দেখা গেলেও গান, কথা ও ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মেছেনিরা পাঁচ বোন হলেন- মেছেনি, গুছি লক্ষী, ডাক লক্ষী, অঘন লক্ষী এবং পৌষ লক্ষী। এগুলি আসলে ফসল উৎপাদনের পাঁচটি পর্যায়। মেছেনি গানের পর্যায় গুলি হলো-ক. নামানি, খ. পারিনি, গ. বাড়িঢুকা, ঘ. বসানি ও চুমানি, ঙ. নাচানি, চ. উঠানি এবং ছ. ভুরাভাসানি।

৫. যাত্রা পূজা :

রাজবংশী সমাজে যাত্রা পূজার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। "আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার দশমী তিথিতে কৃষিজীবী রাজবংশী ও অরাজবংশী স্থানীয় পেশাজীবী মানুষ কৃষি যন্ত্রপাতি, পেশা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে সেগুলিকে পুজো করে থাকেন। যাত্রাসি পাতা বেঁধে দেন যন্ত্রপাতিতে। এরপরে শুভদিন দেখে জমিতে হালযাত্রা করা হয়। পেশাজীবীরা নতুন করে পেশার শুভারম্ভ করবেন।"[৩] এই যাত্রাপূজা উত্তরবঙ্গ ছাড়াও নেপাল, বাংলাদেশ, আসাম, মেঘালয়ে দেখা যায়।

৬. বিষুমা ও সিরুয়া :

"চৈত্র মাসের সংক্রান্তি হল বিষ্ণুমা সংক্রান্তি। ঐ দিন শুদ্ধ দেহে ও মনে ঘরবাড়ি, গাছপালাকে অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে কতগুলো অবশ্য আচরণীয় নিয়ম পালন করতে হয়। বিষ্ণুমা বা বিষয়ার দিন বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, লেপামোছা করা অবশ্য করণীয় কর্তব্য। গৃহ সামগ্রীও পরিষ্কার করা হয়, প্রয়োজনে গোবর লেপা হয়। খড়িমাটির ফোঁটা, সিঁদুরের ফোটা দেওয়া হয়। অন্যান্য ঘরে ও ঠাকুর ঘরে রসুন-পেঁয়াজ, পানিমুথারি, ময়নাকাঁটা গাছের টুকরো একসঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শোলার ফুল ঝোলানো হয়। বিস্তি নামক তিতো ফল খেতে হয়। চাল-ভাজা, চিড়ে ভাজা, ছোলা ভাজা খেতে হয়। গোরু-মোষকে চান করাতে হয়। ২০/২২ রকমের শাক সংগ্রহ করে শাক ভাত খেয়ে উদ্বৃত্ত ভাতে জল দিয়ে নববর্ষে পান্তা করে খেতে হয়। অনেকে সেদিন শিকার করে ওই মাংস রাতে খেয়ে শেষ করে। কারণ, বৈশাখ মাসে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। সেদিন তুলসী গাছের উপরে 'ঝরা' বসানো হয়। পয়েলা বৈশাখে অর্থাৎ সিরুয়ার দিনে পান্তা ভাত খেয়ে দিনের কাজ শুরু হয়। গাছের গোড়ায়, বাঁশের গোড়ায়, আম-কাঁঠালের গোড়ায় মাটি দিতে হয়। বৈশাখ মাস ধর্মমাস। ঐ মাসের প্রতি রবিবারে (ধর্মবারে) আতপ চালের ভাত সৈন্ধব লবণ দিয়ে খেতেন বাড়ির সবাই। জলখাবারেও আতপ চিড়া ও দই খাওয়ার নিয়ম। বৈশাখী সংক্রান্তিতে স্যাবা দেওয়া হয় ঠাকুরবাড়িতে।"[৪]

এই বিষুমার দিনে গাছ লাগানো হয় এবং গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া হয়। কারণ এই বিষুমার দিনে গাছ লাগালে ও গাছের গোড়ায় মাটি দিলে গাছটি ভালো থাকে ও ভালো ফলন হয়।

৭. আষাঢ়ি স্যাবা :

আষাঢ় মাসে 'আমাতি' ও 'রথযাত্রা' হয়। রথযাত্রার দিনে গ্রামেগঞ্জে বয়স্কা মহিলারা 'টুকুনি খেলা'র ব্রত পালন করে থাকেন। কাঁসার ছোট ঘটি কাপড়ে পেঁচিয়ে কমণ্ডলুর মতো করা হয়। উপবাসী থেকে ঐ কমণ্ডলুর ভেতরে জগন্নাথের পুজো দিয়ে জল, দুধ, আতপ চাল রাখা হয়। কলার ভারা দিয়ে ঐ প্রসাদ প্রতি বাড়ি ঘুরে ঘুরে প্রদান করে সিধা সংগ্রহ করা হয়। রাতে সংগৃহীত চাল রান্না করে নিজে ব্রত সমাপন করেন ও অন্যকেও খাওয়ান। আষাঢ় মাসে কোনও সোম, বুধ কিংবা শুক্রবারে গৃহস্থ বাড়ির ঠাকুর থানে আতপ চাল, দুধ, কলা, ঘি, বাতাসা, দুর্বা, তুলসী সহযোগে বাৎসরিক পূজা করে থাকেন। আষাঢ় মাসে কৃষিকাজ শুরুর পূর্বে এই সেবাপূজাকে আষাঢ়ি স্যাবা বলে।

৮. গারামপূজা :

পাড়ার সব গৃহস্থ একদিন সমবেতভাবে পাড়ার গারাম ঠাকুরের থানে গারাম ঠাকুরের পূজা করে থাকেন। পূজার শেষে সকলে দহিচূড়া (চিড়া ও দই) খেয়ে থাকেন।এই পূজার উদ্দেশ্য গ্রামের রক্ষা ও কল্যাণ কামনা। এই গ্রামপূজার মধ্যে গ্রামবাসীর একতার ভাব প্রকাশিত।

৯. গোচরপুনা :

গচিবুনা নামেও খ্যাত এই পার্বণ মূলত পুণ্যাহ। সাধারণত গারাম পূজার আগেই পুণ্যাহ হয়ে থাকে। তবে পরেও হতে পারে। রোপণের সূচনাতে অবশ্য পালনীয় এপরব। এক মুঠো বিচন, একটা কলাগাছের চারা, একটা কালোকচুর গাছ নিয়ে রোপনের জমির এক কোণায় এ পূজা করে গৃহকর্তা। রোপনের শুভারম্ভ এই গুচ্ছবগন বা গচিবুনা।

১০. কাদা খেলা বা দধিকাদ :

কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে রাতে কীর্তন ও জাগরণ পালন করে রাজবংশীরা। পরের দিন গোপাল ঠাকুরের পুজো দিয়ে শিশু-কিশোরেরা কৃষ্ণরূপে ও রাখাল সেজে কাদায় খেলা করে। দই-এর বদলে কাদা মাখে গায়ে। পিচ্ছিল বাঁশ বেয়ে উপরে উঠে নারকেল পাড়ে, দই-এর হাড়ি ভাঙে। এই কাদা প্রতীকি হিসেবে বয়স্করাও গায়ে মাখেন। কাদা অনেকে বাড়িতে নিয়ে যান।সেই কাদা মাখানো মাটি গাছের গোড়ায় দেন।এর ফলে গাছের ফলন বৃদ্ধি পায় এই বিশ্বাস করে থাকেন রাজবংশীরা।

১১. ডাকলক্ষ্মী :

রাজবংশীরা লক্ষ্মী পূজার দিন লক্ষ্মী পূজা করে না।এই ভাক লক্ষ্মী পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে। ধান গাছে এ সময়ে গাব আসে। লক্ষ্মীকে সকাতরে আহ্বান করা হয় প্রতি ঘরে ঘরে। ক্ষেতে, খামারে, ঘরে, বাইরে বাতি (প্রদীপ) জ্বালানো হয়। খইল ছিটিয়ে দেওয়া হয় ক্ষেতে।

১২. ধানে ফুল :

কার্তিক সংক্রান্তিতে গির্থানি (গৃহকর্ত্রী) একটা কুলোয় প্রদীপ, কাঁচি, দা, দুব্বা ইত্যাদি সাজিয়ে কুলোটি মাথায় নিয়ে এবং এক ঘটি জল নিয়ে ধানক্ষেতে যাবেন। ক্ষেতিলক্ষীকে পুজো দিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে সশিষ এক গোছা ধান কেটে কুলোতে রাখবেন। কুলো মাথায় করে নিয়ে আসবেন গোলাঘরে। গোলা ঘরের দরজা, ঘটির জল দিয়ে ধুয়ে গোলায় রাখবেন ধানের গোছা। এরপর শুরু হবে ধানকাটা। এই পূজা গির্থানিরা শ্রদ্ধার সঙ্গে করে থাকেন।

১৩. নয়া খই বা নবান্ন :

নতুন ধানে হবে নবান্ন ১লা অঘ্রাণে। সেদিন দুপুরবেলা ঠাকুরবাড়িতে আতপ চাল, আতপ চিড়া, দুধ, কলা দিয়ে ঠাকুরবাড়িতে (বাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে) স্যাবা বা পূজা দেওয়া হবে। অধিকারী পুজো করবেন, বোষ্টম সেবা গ্রহণ করবেন। অধিকারী (রাজবংশী পুরোহিত) গৃহস্থ বাড়িতে সব পূজা দিয়ে থাকেন। নতুন চালের ভাত, ঠাকুরির ডাল (মাসকলাই ডাল), নতুন নতুন শাক, পুকুরের মাছ দিয়ে হয় নবান্নের ভোজন। পিতৃপুরুষ, শিয়াল ঠাকুর, কাকপক্ষিকে নবান্ন প্রথমে দিয়ে গৃহস্থ ও প্রতিবেশীরা মিলে নবান্নের পার্বণ পালন করাই রীতি।

১৪. গছা দেওয়া :

কালীপুজার চতুর্দশীতে বাড়িতে কলাগাছ পুঁতে তার গায়ে বাঁশের কাঠি দিয়ে প্রদীপদানি তৈরি করে, নতুন প্রদীপ জ্বালিয়ে, গৃহকর্তা সারাদিন উপোষ থেকে সন্ধ্যায় চোদ্দ পুরুষের উদ্দেশ্যে চোদ্দ বাতি দিয়ে থাকেন। চোদ্দ শাক খান।গছা দেওয়ার দিন সিদোল,মাছ মাংস, খাওয়ার রীতি আছে।

১৫. পুষুণা বা সংক্রান্তি :

পৌষ সংক্রান্তিতে ঠাকুর থানে পুজো দিয়ে পিঠে-পুলি বানানো শুরু হয়। ঠাকুরকে নিবেদন করা হয় পিঠে। পুষুণা পরব অনুষ্ঠিত হয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের প্রতিটি ঘরে ঘরে। রাজবংশীদের পিঠে গুলি হল - সাদা পিঠে, পৌয়া পিঠে, কান মুচুরি পিঠা ইত্যাদি। তবে বর্তমানে এখন অনেক ধরনের পিঠা রাজবংশীরা সংক্রান্তির দিন তৈরী করে।

১৬. হুদুমদেও :

"রাজবংশীরা একটি কৃষিজীবী সমাজের অংশ। কৃষিকাজের মধ্য দিয়েই তাঁদের জীবনধারণ করতে হয়। এমন একটি সমাজে তাই জমিতে জলের অভাব যথেষ্ট উদ্বেগের ছবি ফুটিয়ে তোলে। পরিবারের মহিলারা এই উদ্বেগের, কষ্টের, দুঃখের সময় প্রকৃতির কাছে জলের জন্য প্রার্থনা জানান। অনাবৃষ্টি কাটিয়ে বর্ষা আনতে রাজবংশী, কোচ, মেচ প্রভৃতি সমাজের মহিলারা বৃষ্টির দেবতা হুদুমদেওকে পুজো করেন। প্রাচীন প্রথা মেনে অন্ধকার রাতে গ্রামের মহিলারা দল বেঁধে লোকালয় থেকে দূরে কোনও কৃষি জমিতে উপস্থিত হন। সেখানে কোনওভাবেই কোনও পুরুষের প্রবেশের সুযোগ নেই। মহিলারা প্রথা মেনে হুদুমদেও ঠাকুরের পুজো করেন, মন্ত্র পড়ে ও গান করে। এবং পুজো শেষে বিবস্ত্রা হয়ে নিজেদের কাঁধে জোয়াল তুলে গরুর মত জমিতে লাঙল টানেন। এরপর বিবস্ত্রা মহিলারা গান এবং নাচ করে হুদুমদেওকে আহ্বান করেন। বিভিন্ন মৈথুন, যোনি, লিঙ্গ, রমণ, আদিরসাত্মক অশ্লীল শব্দের প্রচুর ব্যবহার গানের এবং পুজোর ভাষায় ফুটে ওঠে।ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় মহাশয় তাঁর গবেষণামূলক বইটির উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ ১৩৬ পৃষ্ঠায় পৃথিবীর কিছু স্থানে এমন মহিলা বাহিনীর নেতৃত্বে অনাবৃষ্টি কাটাতে যে পুজো দেওয়া হয় তার কথা লিখেছেন। বোধহয় এমন হুদুমদেও দেবতার পুজো বিশ্লেষণ করে নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় তাঁর বাঙালীর ইতিহাস বইটির ৩০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, সুশস্য উৎপাদনের আশায় নরবলি এবং যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল প্রাচীন বঙ্গের এক প্রধান লোক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। বঙ্গদেশে রাজবংশী ছাড়া অন্য কোনও সমাজের মধ্যে এমন নাচগানের পুজোর কথা পাওয়া যায় না, তাই নীহারবাবু রাজবংশীদের কথাই উল্লেখ করেছেন বলে মনে করা যেতে পারে।"[৫]

১৭. গমীরা :

"পুজো, বন্দনা, নাচ, গান, দেহ কসরতের এক সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ গমীরা। বছরের শেষে চড়কের মেলায় এর সমাপ্তি। শিবকে কেন্দ্র করেই এইসব আয়োজন। শিবের ত্রিশূল এবং কাঠের গৌরীর পার্টসহ গমীরার দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ-গান করে দেহ কসরৎ দেখিয়ে চাল ডাল অর্থ সংগ্রহ করে। শিব ছাড়াও বিভিন্ন দেবতা এবং অপদেবতার পুজো গমীরাদলের লোকেরা করে থাকেন। একে লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের এবং ঐতিহাসিক উপাখ্যানের মেলবন্ধন বলা যেতে পারে। ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়ের মতে মালদা, মুর্শিদাবাদের গম্ভীরার উৎপত্তির ইতিহাস লুকিয়ে আছে গমীরার মধ্যে।"[৬]

১৮. ব্যাঙের বিয়ে :

"প্রাকৃতিক নিয়ম মতো সঠিক সময়ে বর্ষা না আসায় কৃষকগণ যখন কৃষিকাজে যুক্ত হতে পারছেনা। তখন এই ব্যাঙের বিয়ে দেয়।পৌরাণিক চিন্তা ধারায় বিশ্বাসী রাজবংশী কৃষকগণ মনে করে বর্ষার আগমন বার্তা ব্যাঙেরা নিয়ে আসে। বৃষ্টির দেরি দেখে তারা দুটি সোনা ব্যাঙ্ ধরে বর পক্ষ ও কন্যাপক্ষ সেজে দুটি ব্যাঙের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হয়। আনন্দ ফুর্তি করা ও খাওয়াদাওয়া হয়।বর্তমানে বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষিত রাজবংশী কৃষকেরা এই সমস্ত অপসংস্কৃতিকে বিশ্বাস করেনা এবং আমলও দেয় না। যার ফলে ব্যাঙের বিয়ে অনুষ্ঠানটি লুপ্ত হওয়ার পথে।"[৭]

১৯. চড়ক পুজো :

বারো মাসে তেরো পার্বণের শেষ উৎসব হল চড়ক সংক্রান্তি। ঠাকুরের পাট নিয়ে ব্রতীরা প্রায় সারা চৈত্র মাস ধরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল, ডাল, সবজি সংগ্রহ করে এবং সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত নিরামিষ খাবার খায়, বাইরে রাত কটায় ব্রতীরা। সংক্রান্তির দিন (চৈত্র) ব্রতীরা আগুনের উপর দিয়ে হাঁটেন, জিভে বড়শি গাঁথেন, ঠোঁটে, পিঠে এবং চড়কে ঘোরেন।

উপসংহার :

আলোচনার শেষে বলা যায় "সমগ্র রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন পূজানুষ্ঠানে প্রজনন শক্তি বা উর্বরাতন্ত্রের আধার হিসাবে নারীদের কল্পনা করা হয়। রাজবংশীরা বিশ্বাস করেন- যেমন নারী ও পুরুষের মিলনের ফলে সন্তান উৎপাদন হয়, তেমনি কৃষি ক্ষেত্রেও বৃষ্টি কিংবা সূর্যের মিলনে শস্য উৎপাদিত হয়। তাই নারী ও জমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধির আকাঙ্খায় প্রচলিত হয়েছে কৃষিক্ষেত্র কেন্দ্রিক ও নারী কেন্দ্রিক বিভিন্ন পূজানুষ্ঠান। রাজবংশী লোকচারণার এই বিভিন্ন প্রকার কৃষিকেন্দ্রিক তথা নারীকেন্দ্রিক পূজানুষ্ঠান নৃ-সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে কৃষিসংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত উর্বরাতন্ত্রের কৌমভাবনা এবং লোকায়ত জীবনের সহজ সরল অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ এক লোকশৈলী। অপর দিকে বিভিন্ন প্রকার পূজানুষ্ঠানে 'মাড়েয়ানী' তথা নারীর প্রাধান্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় বাহী।"[৮] এই বিশ্বায়নের যুগেও উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের কৃষি কেন্দ্রিক সংস্কৃতির ধারা আজও অপরিবর্তিত আছে।

তথ্যসূত্র :

১. বর্মা, দিলীপ, লোকদেবতার ঐতিহ্য, ভান্ডানি, মাসান ও মাশান, জলপাইগুড়ি জেলা সার্ধশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৬৯-২০১৯), সম্পাদনা উমেশ শর্মা-কৃষ্ণেন্দু দত্ত-বাবলু রায়-কৃষ্ণেন্দু রায়, পৃ. ৪০১
২. শর্মা, উমেশ, তরাই ডুয়ার্সের পূজা পার্বণ,তরাই-ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতি, ২০১৮ সম্পাদনা, আব্দুল রহিম গাজি, পৃ. ৪২২
৩. রায়, ড.গিরিজা শঙ্কর, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা পার্বণ, গবেষণা পত্র, ১৯৭৫, পৃ. ৫১
৪. রায়, ড. দীপক কুমার, রাজবংশী সমাজ আরো সংস্কৃতির কাঁথা,২০১২, পৃ. ৪৬
৫. রায়, ড. গিরিজা শঙ্কর, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা পার্বণ, পৃ. ১৩৬
৬. প্রধান, অশোক রায়, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গ ও রাজবংশী, ২০০৬, পৃ. ১০৫-১০৬
৭. সামাট, নারায়ণ, বাংলার সংস্কৃতি: লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায়,২০১৮, পৃ. ৫০১-৫০২
৮. রায়, জিতেশ চন্দ্র, রাজবংশী ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রেক্ষিত উত্তরবঙ্গ, ২০২১, পৃ. ৫৭

সাক্ষাৎকার :

১. সাক্ষাৎকার, ধীরেন রায়, বয়স-৬৫, পেশা-কৃষিকাজ, ময়নাগুড়ি।